দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 3 1 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও লাভের খাতা শূন্য

জয়পুরহাটে ৩শ' আনন্দ স্কুলে শিক্ষার নামে চলছে লুটপাট

জয়পুরহাট থেকে মুহাম্মদ আবু মুসা
সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন দাতা সংস্থা ড্যানিডার অর্থায়নে জয়পুরহাট জেলা সদরে ১৩টি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এনজিও)-এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় ২৭৭টি আনন্দ স্কুলে অনিয়ম, লুটপাটসহ নানা দুর্নীতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

জয়পুরহাট সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাজুল ইসলাম মণ্ডল জানান, ২০০৬ সালে ১৪২টি, ২০০৭ সালে ২৩টি এবং ২০০৮ সালে ১১৩টি মোট ২৭৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩টি এনজিও কর্তৃক আনন্দ স্কুলগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে, এর মধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার কারণে ১টি কেন্দ্রের স্কুল ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হলে বর্তমানে ২৭৭টি কেন্দ্র স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কিন্তু সরেজমিনে পাওয়া গেছে উল্টো চিত্র।

নিয়ম অনুযায়ী সরকারী-বেসরকারী স্কুল থেকে ঝরেপড়া বা স্কুলমুখী না হওয়া ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দ স্কুল বা এ ধরনের উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলো পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও এসব আনন্দ স্কুলে তা মানা হচ্ছে না। প্রায় সব কটি আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী কোন না কোন সরকারী স্কুলের নিয়মিত শিক্ষার্থী। এমন কি অন্যান্য এনজিও'র শিক্ষার্থী নিয়েও আনন্দ স্কুল চলছে বহাল তবিয়তে। জয়পুরহাট সদর উপজেলায় খঞ্জনপুর বুড়িতলা আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী একই গ্রামের সহিদুল ইসলামের মেয়ে শিমা (১১) ও আলম কাজীর মেয়ে খাদিজা (১২) জানিয়েছে, তারা একই সংগে আনন্দ স্কুলে ও পার্শ্ববর্তী পিটিআই স্কুলে পড়ে। এছাড়া ধানমন্ডির পূর্নিমার ছেলে রাশিক, আরামনগরের আবু ঈসার মেয়ে এশা, মুহির উদ্দিনের মেয়ে মৌসি একইসঙ্গে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও আনন্দ স্কুলে পড়ছে। তেঘর পালপাড়া আনন্দ স্কুলের সব শিক্ষার্থী এক যোগে বলে, 'লেখাপড়ায় ভালো হওয়ার জন্য আমরা প্রাইমারি, ব্রাক ও আনন্দ স্কুলে পড়ি।' একই অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক এলাকাবাসীর। চাকরি হারানোর ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আনন্দ স্কুলের একাধিক শিক্ষক বলেন, সবকটি স্কুলেই কমবেশি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থী আছে। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, বাড়তি অর্থপ্রাপ্তির জন্য একদিকে অভিভাবকরা জেনে শুনে এনজিও কর্মকর্তা বা আনন্দ স্কুলের শিক্ষকদের প্রভাবিত করে তাদের ছেলেমেয়েদের একই সাথে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর পাশাপাশি এনজিওদের এসব উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলগুলোতে ভর্তি করান, অন্যদিকে এনজিও'রা তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে ও সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ যায়েজ করতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের নামে অসংখ্য স্কুলগামী শিক্ষার্থী নিয়ে এসব স্কুল কেন্দ্র স্থাপন করে অবাধে সরকারী টাকা লোপাট করে আসছে। যেন দেখার কেউ নেই।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান, আনন্দ স্কুলের জন্য সরকারের খরচ হয়-শিক্ষার্থীপ্রতি মাসে উপবৃত্তি হিসেবে প্রথম-তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ টাকা, চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে ৬০ টাকা, প্রতি বছর শিক্ষার্থীর পোশাক বাবদ ২শ' টাকা, মাসে শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষক-সম্মানী বাবদ শিক্ষার্থীপ্রতি ২৪০ টাকা হারে দেওয়া হয়, প্রতি স্কুলের ঘর ভাড়া বাবদ্ বছরে ২ হাজার টাকা ও তত্ত্বাবধায়ন বাবদ বছরে সংশ্লিষ্ট এনজিওদের দেওয়া হয় শিক্ষার্থীপ্রতি ১শ' টাকা হারে। সব মিলে জয়পুরহাট জেলা সদরে চলমান ২৭৭টি আনন্দ স্কুলের জন্য প্রতি বছর খরচ হয় প্রায় ৭৫ লাখ টাকা, আর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ বছরে এ খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

এ বিশাল অংকের অর্থ খরচের খাত আর অর্থ ব্যয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এনজিওদের লুটপাটের নানা অভিনবপন্থা। 'স্থায়ীভাবে আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা হবে'- এমন লোভ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে শিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে মোটা অংকের অর্থ। চাকরি হারানোর ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষক ও তাদের পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার নাম করে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃপক্ষকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। ২৮ থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলগুলো চালু করা হলেও অধিকাংশ স্কুলেই তালিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থী নেই। তেঘর বিশা গ্রামের পালপাড়া আনন্দ স্কুল বসার সময় বিকেল ৪টায় হলেও ৫টার সময় মাত্র ৮ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত পাওয়া গেছে, একই সময়ের একই এলাকার সামাদেরপাড়া স্কুলের শিক্ষককে স্কুলে যেতে দেখা যায়, পূর্ব পাগুরিয়া স্কুলে ছুটির পূর্বে উপস্থিত পাওয়া যায় মাত্র ১১ জন শিক্ষার্থীকে। একই অবস্থা কম-বেশি অধিকাংশ স্কুল কেন্দ্রেরই বলে দাবী করে শিক্ষকরা জানান, স্কুল শুরুর সময় তাদের এনজিও কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর যে তালিকা দিয়েছেন বেশিরভাগ স্কুলেই ওইসংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। কিন্তু উল্লেখিত পরিমাণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী উপবৃত্তি ও উপকরণসহ শিক্ষক সম্মানী অর্থ উত্তোলন করে এনজিও কর্তৃপক্ষ টাকা কেটে নিয়ে প্রকৃতসংখ্যক শিক্ষার্থীর বিপরীতে উপবৃত্তি ও শিক্ষক সম্মানী দিয়ে থাকেন। পালপাড়া স্কুলের শিক্ষক মুর্শিদা, নারায়নপাড়া স্কুলের শিক্ষক নূরে জান্নাত যুথীসহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষকই জানান-৬ মাস পরপর উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক সম্মানী দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে তাদের ৮ হাজার ৪শ' টাকা পাওনা হলেও ১ হাজার ২শ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এমন অভিযোগ অনেক শিক্ষকেরই।

বিস্তর অভিযোগ নামকরণেও। প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা নিরানন্দ-কষ্টদায়ক এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় বলে হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে হয়তো নামকরণ করা হয় 'আনন্দ স্কুল'। কিন্তু 'আনন্দ' শব্দটির প্রতি এতই অবিচার করা হয়েছে যে, কোমলমতি শিশুরা এই শব্দটির উল্টো অর্থ বুঝতে বাধ্য হবে। বই, পুস্তক, খাতা, কলম, ব্লাকবোর্ড ছাড়া শিক্ষা উপকরণের তেমন কিছুই চোখে পড়েনি।